# আমরা প্রায় সমবয়সী

ওবায়েদ উল হক

বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের বয়স ৫০ বছর পুরো হলো। উল্লেখ করার ও উল্লসিত হবার মতো তথ্য বটে। চার্লস ডিকেন্স সৃষ্ট একটি চরিত্র মিস্টার টোয়েমলো 'হাউস অব কমন্স' সম্পর্কে বলেছেন– 'I think that is the best club in London'. এদেশের কোনও টোয়েমলো জাতীয় সংসদ ও জাতীয় প্রেস ক্লাব সম্পর্কে এমন কোনও উক্তি করেছেন কিনা জানি না।

জাতীয় প্রেস ক্লাব বাংলাদেশের অবিভক্ত সাংবাদিক সম্প্রদায়ের অখণ্ডিত ঠিকানা হতে পারাই যথেষ্ট শ্লাঘার ব্যাপার। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ সাল এই ৫০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর গৌরবগাথা রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যেতে পারে। এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি আনন্দোৎসবের লগ্ন সন্দেহ নেই।

বয়সের বিচারে আমি অবশ্য অনেক এগিয়ে। ১৯১১ সালের ৩১ অক্টোবর আমার ভবলীলার প্রথম দিন। এ লীলা সাঙ্গ হবার দিনও সন্নিকট। শরীর নামক মহাশয় এখন একেবারেই অবাধ্য। কিছুই সয় না। দেহ যন্ত্রটির সকল অংশ বহুল ব্যবহারে জীর্ণ, অচল। মন প্রায়ই আনমনা। শেকসপিয়ারের কথায়– 'Age is in, the wit is out' এই দশা।

তবে সাংবাদিকতা কালের গণনায় তফাতটা বেশি নয়। প্রায় নেক টু নেক। আমার সাংবাদিক-জীবন শুরু হয় ১৯৫১ সালে, বলা যায় আমাকে বিস্মিত করেই। অনেকটা দৈবায়ত্ত। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অবিভক্ত বাংলার বিবেকহীন মুনাফালোভী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-সৃষ্ট কৃত্রিম খাদ্য সংকটের ফলে ৫০ লক্ষ দরিদ্র মানুষ অনাহারে মারা যায়। সম্পূর্ণরূপে অকারণ ও অভাবনীয় সেই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মুনাফাখোর, মজুতদার ও কতিপয় উচ্চপদস্থ অর্থগৃধ্নু কর্মকর্তা ছাড়া আর সকলের মনেই অশেষ বেদনা ও প্রশ্নের সঞ্চার করে। সেই চেতাল্লিশের মন্বন্তর নিয়ে 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' নামে একটা বড় গল্প লিখলাম। অসহায় কাঙালদের গণমৃত্যু বা গণহত্যার একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছিলাম তাতে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা মাসিক সওগাত, মোহাম্মদী, বুলবুল ও ছায়াবীথিতে গল্প, নাটক, রম্যরচনা ইত্যাদি লিখতাম। এই গল্পটিও তাতে ছাপার জন্যে পাঠাতে গিয়ে ভাবলাম, যাদের জন্যে লেখা সেই নিরক্ষর কাঙালেরা তো পড়তে পারে না। তারা কেন এমন দলবদ্ধ হয়ে মারা যায়, কেন অসাধু ব্যবসায়ের বলি হয়, তা তো জানতে

পারবে না। কথাগুলো তাদের জানাবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সিনেমা, চলচ্চিত্র। ছবির মাধ্যমে বলা কাহিনী অজ্ঞ মূর্খরাও বুঝতে পারে।

অতএব বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের কেন্দ্র কলকাতায় গেলাম। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও থেকে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছায়ানট পিকচার্স এর প্রযোজনায় 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' নামের পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি নির্মাণ করলাম। ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও ঢাকাসহ বাংলা-আসাম সার্কিটের অনেকগুলো সিনেমা হলে ছবিটি মুক্তি পেলো সেই সময়ের অতিশয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফাঁড়া কাটিয়ে। কিন্তু আরেকটি ফাঁড়া সামনে এসে দাঁড়ালো, যা কিছুতেই কাটানো সম্ভব হয়নি। ভারত ভাগ হলো এবং পাকিস্তানের জন্ম হলো। কলকাতা রইলো ভারতে। আমাদের পূর্ব বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান।

সুতরাং সব ফেলে রেখে আমাকে চলে আসতে হলো পূর্ববাংলার মহকুমা শহর (এখন জেলা) ফেনীর বাড়িতে। তখন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনও সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ফলে বেকার জীবন। দেহ ও মনের পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ঊনপঞ্চাশ সালে ঢাকা থেকে ইংরেজি ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর থেকে সেই পত্রিকায় লিখতে লাগলাম।

একান্ন সালে ঘটলো এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদক জনাব আবদুস সালামের ২৫ জুলাইয়ে লেখা একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন– ".....I believe it will be very good for you if instead of lying quiescent on bed at Feni you could join us here as a member of the Editorial Board. .....We shall pay you to start with between Rs. 300 and 400 per month. This is nothing for you, but this will give you a change of scene and occupation which must have beneficial effects on your health." সম্পূর্ণভাবে বিস্ময়কর, অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রস্তাবিত টাকার অঙ্ক মোটেই বিবেচ্য নয়। অকেজো দিনগুলোর অবসানের সম্ভাবনাই আসল কথা। তবে এ পেশা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কারণে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সালাম সাহেব সিরিয়াস। আমার নীরবতায় তিনি নিরুৎসাহিত হননি। ৭ আগস্টে তাঁর একটা টেলিগ্রাম এলো– 'Please join immediately'

অনেকটা কৌতূহলবশেই ঢাকায় এলাম। জনসন রোডে অবজারভার অফিসে এসে প্রবেশ করলাম নতুন এক জগতে, যেখানে প্রবেশ ও থাকার অলঙ্ঘনীয় শর্ত হচ্ছে কৌতূহল বা অজ্ঞাতকে জানার আগ্রহ। সেদিন থেকে প্রখ্যাত সম্পাদক আবদুস সালামের উদ্যোগ ও সৌজন্যে একজন অখ্যাত সাংবাদিক হিসেবে আমার যাত্রা শুরু হয় অজানা এক জগতের বন্ধুর পথে। তিনিই আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে এলেন চলচ্চিত্র জগতের সার্থক-অসার্থক সৃজনশীল কর্মকাণ্ড থেকে সংবাদপত্র জগতের প্রতিদিনের রোমাঞ্চকর বিশ্ব আবিষ্কারে।

আমার সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও চির অমলিন স্মৃতি পাকিস্তান অবজারভারের পতন ও বাংলাদেশ অবজারভারের উত্থান। একাত্তরের ষোল ডিসেম্বরে

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের গৌরবজনক বিজয়ের দিনে যখন মিত্রপক্ষের কাছে পরাজিত পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল লেখা হচ্ছিল, তখন অবজারভার ভবনে অবজারভার পত্রিকার নাম থেকে পাকিস্তান শব্দটিকে নিশ্চিহ্ন করে সে জায়গায় বাংলাদেশ শব্দটি বসানোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার বিরল আনন্দ কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

Dean of ST. Pauls W. R. Inge (প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্যে যাঁকে রেড ডীন বলা হয়) বলেছেন– "The distinction between literature and journalism is bearing blurred; but journalism gains as much as literature loses." কথাটা আমাদেরও মনে রাখা ভালো।

দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। প্রায়শই নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে নবতর রূপসজ্জা ও বলিষ্ঠতর অঙ্গীকার নিয়ে। মানের বিচারেও পিছিয়ে নেই। এখন আর টেলিপ্রিন্টারের depression in Bay of Bengal পত্রিকায় বঙ্গোপসাগরে হতাশা হয়ে দেখা দেয় না। কিংবা পুলিশ রাস্তায় patrol দিতে গিয়ে petrol ঢালে না। তবে সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বেড়ে চলেছে সাংবাদিকের জীবনের নিরাপত্তাহীনতাও। এ যাবৎ বেশ ক'জন বিশিষ্ট সাংবাদিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আরও অনেককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস নেই। হত্যার বিচার হয়নি। হত্যার হুমকিতে সাংবাদিক ছাড়া যাদের বিচলিত হবার কথা, তারা অবিচলিত।

অথচ সাংবাদিক তো Watch dog of public interest জনস্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। সে হিসেবে জনগণের পরম মিত্র। জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন সব গোপন কাজকারবার ও অজানা তথ্যাদি উদঘাটন করে সাংবাদিক জনস্বার্থ রক্ষা করেন। তাঁর অনুসন্ধানী রিপোর্টিং বা investigative reporting, muckraking, public conscious journalism বা literature of exposure -এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনস্বার্থ বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড জনসমক্ষে তুলে ধরা। আমেরিকায় এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে বেশ কিছু জনহিতকর আইন পাশ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসন এমন একটি আইনে স্বাক্ষর করার সময়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, "One voice which spoke so often and eloquently for measures like this is still today- the voice of Rachel Carson.....We owe much to her and to those who still work for the cause of a safer and healthier America." একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশের জন্যে যেসব নিবেদিতপ্রাণ, নির্ভীক সাংবাদিক কাজ করছেন, তাঁরা নিহত ও আহত হচ্ছেন তাদের দ্বারা, যারা প্রকাশ্যে দেশের বন্ধু সেজে গোপনে জাতীয় স্বার্থ পদদলিত করে চলেছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে কায়েমী স্বার্থের কপটতা ও শঠতার গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোয় আনা ও সত্যকে মিথ্যার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার একটা সুপরিকল্পিত প্রকল্প জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে কিনা জানার অসীম আগ্রহ মনে লালন করি।

বাংলাদেশের প্রেস ও জাতীয় প্রেস ক্লাব চিরস্থায়ী হোক।

*লেখক অধুনালুপ্ত টাইমস-বাংলা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ অবজারভারের সাবেক সম্পাদক*